ফেলে আসা দিনগুলো

হাসানউজ্জামান খান

মনে করেছিলাম দেশে সাংবাদিকতার একটা ইতিহাস লিখলে মন্দ হয় না। কিন্তু ইতিহাস লেখার জন্যে গবেষণা,বিপুল পড়াশোনা, সময় ও যে পরিশ্রমের প্রয়োজন, তার কোনওটাই আমার নেই। ইতিহাস মানুষের ক্রিয়াকাণ্ডের বিবরণ-বিশ্লেষণ। কিন্তু ইতিহাসের চরিত্ররা সবাই এক একটি মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ান। সে মুখোশের পেছনে কি আছে, তা উন্মোচন করাও ইতিহাসবিদদের দায়িত্ব। কিন্তু সে দায়িত্ব কি আমরা সব সময় পালন করতে পারি বা পারলেও কি সব সময় তা প্রকাশ করতে পারি? তাই সহজতর বিষয় হিসেবে আমার সাংবাদিকতা জীবনের কিছু ছোট-খাট উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছি। ছোট উপাখ্যানও সময় সময় ইতিহাসের মালমশলা হতে পারে। শুরুটা করি কাকাবাবুকে দিয়ে। আমি তখন 'আজাদ' থেকে সদ্য 'স্বাধীনতা' পত্রিকাতে যোগ দিয়েছি। স্বাধীনতা পত্রিকা বের হয় ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে। সেখানে অধিকাংশই ভলান্টিয়ার কর্মী। তারা বিনা বেতনে কাজ করেন। যাঁরা সার্বক্ষণিক কর্মী, তাঁরা পান মাসে ত্রিশ টাকা। যেহেতু আমি বাইরে থেকে এসেছি, তাই আমাকে দেয়া হলো মাসে ৩৫ টাকা আর ট্রামের কুপন। পত্রিকা বের হয় ডোভার লেন থেকে। কিছুদিন পর ডেকার্স লেনে তিনতলা বাড়িতে স্থানান্তর। কাকা বাবু সেখানে সার্বিক দেখাশোনার দায়িত্বে।

এক দিন নিউজ এডিটর সুকুমার দা'র টেবিলে এক জোড়া চশমা পাওয়া গেল রাত দু'টোর পর। তখন আমি ছাড়া নিউজে কেউই নেই। পরদিন সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম। কেউ বলতে পারলেন না চশমাটা কার। তাই নোটিশ বোর্ডে একটা চশমার ছবি এঁকে লিখে দিলাম- পাইয়াছি। আর কিছুই লেখা নেই। পরে কাকাবাবু তাঁর চশমাটা নিয়ে গেলেন আর ঘোঁতঘোঁত করে বললেন, "হুঁ পাইয়াছি।" তিনি যে মোটেই অসন্তুষ্ট হননি, তা আমার বুঝতে বাকি ছিল না।

১৯৪৭ সালের এক দাঙ্গার পর মুক্তাগাছার মহারাজা সিতাংশু আচার্য চৌধুরীকে তাঁর লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ি থেকে অল্পকালের জন্যে নিরাপদ এলাকায় সরে যেতে হয়েছিল। তাঁর বাড়িটি ছিল হিন্দু-মুসলিম দু'এলাকার সঙ্গমস্থলে। কিন্তু খালি বাড়ি পেলে স্কোয়াটাররা দখল নিতে পারে এ বিবেচনায় তার ভাই ব্যারিস্টার স্নেহাংশু আচার্য চৌধুরী কাকাবাবুকে তাঁর মুসলমান বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সে বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকতে অনুরোধ করলেন, যতদিন না তাঁর ভাই ফিরে আসেন।

প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। তারা ছাড়া কর্মচারীদের জন্যে একটি দোতলা আউট হাউস, কয়েকটি গাড়ির গ্যারেজ ও তার ওপর ড্রাইভারদের থাকার ঘর। সেখানে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আমিও গিয়ে উঠলাম। ওপর-নিচ দু'তলাতেই মাঝখানে বিশাল হল ঘর, আর তার চারপাশে শোবার ঘর। নিচতলায় এক ঘরে বুলবুল চৌধুরী সস্ত্রীক থাকতেন। আর কে কে নিচতলায় ছিলেন, আজ আর তা মনে নেই। ওপর তলায় এক ঘরে সস্ত্রীক মনসুর হাবিব (পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার ও মন্ত্রী), এক ঘরে কবি গোলাম কুদ্দুস, আমানুল্লাহ সৈয়দ (মনসুর হাবিবের ছোট ভাই) ও আমি। গাড়ি বারান্দার ওপর আবদুল হালিম ও তাঁর স্ত্রী অশ্রু হালিম। ওপর তলায় আরও দু'টি পরিবার ছিলেন, তাদের নাম মনে করতে পারছি না। আউট হাউসের উভয় তলায় পাঁচ ছয়টি পরিবার থাকতেন, তার মধ্যে কেবল ইসরায়েল ভাই ও গনিমা ভাবীর কথা মনে আছে। তার ঘরেই আমাদের আড্ডা জমতো বেশি। গ্যারেজের ওপর ড্রাইভারদের এক ঘরে কাকাবাবু আর অপর ঘরে আবদুল্লাহ (?) রসুল সাহেব।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমাদের প্রতিটি ঘরের সঙ্গে একটি করে বাথরুম ও একটি করে রান্না ঘর। যে যার মতো রান্না করে খাচ্ছেন। আমানুল্লাহ সৈয়দের কল্যাণে আমার খাবারটা তার ভাবীর কাছ থেকে আসতো। মহারাজার এক খাস ধোপা ছিল। সে তখন মনিবের অভাবে বেকার। তাতে আমাদের খুব সুবিধে হয়ে গেল– বাইরে লন্ড্রিতে চার্জ দু'আনা কিন্তু কাপড় পড়ে থাকলে আমাদের চলে না। চার আনা দিলে ২৪ ঘণ্টা পর ডেলিভারী। এত পয়সাই বা কোথায় পাবো? রাজার ধোপাকে দু'আনা দিলে সকালের কাপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করে দুপুরে বিছানার ওপর রেখে যেতো। এ সুখ অবশ্যই বেশি দিন থাকেনি।

এরপর একেবারে পাকিস্তান অবজারভারের কালে আসি। আমি তখন নাইট এডিটর (অর্থাৎ রাত্রির শিফটের স্থায়ী ইনচার্জ)। নিউজ এডিটর এ বি এম মূসা। ১৯৫৮ সালের বোধ হয় ৯ অক্টোবর রাতে দুটোর পর শেষ কপি প্রেসে পাঠিয়ে অপেক্ষা করছি কম্পোজ হয়ে গেলে মেকআপে যাবো। অবশ্য মূসা অত রাত্রে থাকতো না। সোয়া দুই আড়াইটার দিকে মালিক হামিদুল হক চৌধুরী টেলিফোন করে জানতে চাইলেন, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে কোনও খবর আছে কিনা! টেলিপ্রিন্টার মেশিন তখন বেশ কিছুক্ষণ ধরে নিশ্চুপ। আমি সে কথাটা বলতে বলতে মেশিনটা খটাখট করে চালু হয়ে গেলো। দৌড়ে গিয়ে দেখি দেশে মার্শাল ল' জারি হয়ে গেছে। কাজেই আবার নতুন করে খবর লেখা, কম্পোজ করা, পুরোনো সংবাদ বিপজ্জনক কিছু থাকলে তা বেছে বাদ দেয়া, তার পর নতুন মেকআপের চিন্তা ভাবনা। এটাই আমাদের প্রথম মার্শাল ল'র অভিজ্ঞতা। মার্শাল ল'র জামানায় একটার পর একটা হুকুমনামা জারি হতে থাকলো। সেগুলো হুবহু ছাপাতেই হতো। কারণ তাতে বহু রকম বিধি নিষেধ, তা অমান্য করলে সাজার হিসেব এগুলোতে থাকতো।

একদিন সরকারী তথ্য দফতর থেকে নির্দেশ এলো মার্শাল ল'র হুকুমনামা ও সরকারী প্রেস নোট ছাড়াও সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও হ্যাণ্ড আউট সবই হুবহু ছাপাতে হবে, নইলে বিপদ আছে। এটা মানতে আমাদের ঘোরতর আপত্তি। মূসার নির্দেশে তখন সেগুলো পয়েন্ট হেডিং দিয়ে ক্ল্যাসিফায়েড বিজ্ঞাপনের পাশে পরপর সাজিয়ে ছাপিয়ে দিলাম। ওগুলো দেখতে

বিজ্ঞাপনের মতোই মনে হতো। সাত দিনের মধ্যেই সে সরকারী নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছিল।

সে জামানারই আর একদিনের ঘটনা। বন্ধুবর সঞ্জীব দত্ত তখন মধ্য প্রদেশের এক করদ রাজ্যে দেওয়ানগিরি শেষে ফিরে আবার অবজারভারের সিনিয়র সাব এডিটর। আমি রাত্রের দায়িত্বে। তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আমার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনার তো খুব সাহস'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?' তিনি বললেন, 'যে সব সংবাদ আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে আসছি, তা আপনি নির্দ্বিধায় ফেলে দিচ্ছেন, আর যেগুলোর মোটেই গুরুত্ব নেই, তা দিয়েই লীড বানাচ্ছেন। এ রকম সাহস আমার হতো না।'

আমি তাঁকে তখন বললাম, 'আপনি গোড়াতেই ভুল করেছেন। আমি সাহসী বলে এরকম করছি না। করছি ভয়ে।'

আজও সে ভয় আমাদের পুরোপুরি কাটেনি।

লেখক জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম, বাসসের সাবেক ব্যবস্থাপনা সম্পাদক